কৈলাসে রোবিয়েট

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

লিইবার ফিয়েরা

আমার কথা

ইয়েতি কি একটা মিথ? সে কি শুধুই বিনোদন উৎপাদনকারী কল্পকাহিনির নায়ক অথবা বাস্তবের কোনও চরিত্র? তুষারমানব কি সত্যিই আছে এই জগতে? থাকলে সে কোন প্রজাতিরমানুষ অথবা মানবেতর? অথবা অতিমানব বা সুপারম্যান? এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। যে কোনও বিতর্কিত বিষয়েই বিজ্ঞানীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন সে বিতর্কের অবসান ঘটাতে। সত্যের সন্ধান আর উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে তার প্রতিষ্ঠাই তো বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এমনকীছু বিষয় থাকে যার সমাধান সহজে হয় না। যুগ গড়িয়ে যুগন্তরের মাটিতে পা রাখলেও সত্য বা মিথ্যার মীমাংসা হয় না কিছুতেই। ইয়েতি হয়তো এমনই এক বিষয়। ইয়েতির ধারণা বা কল্পনা ঠিক কোথা থেকে কেমন করে এসেছিল এটা বলা খুব শক্ত। তবে এসেছিল আর সে যে এখনও দিব্যি বসে আছে মানুষের মনে সেটা ভুল নয়। এখনও মানুষ এই জগতে এক প্রবল শক্তিধর মানুষ বা সুপারম্যানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এটার কারণ আর কিছুই নয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত, উপেক্ষিত মানুষ নিজের থেকেও শক্তিশালী কারোর কল্পনা করে যাতে এই শক্তি তার বঞ্চনার উপশম ঘটাতে কিছুটা সক্রিয় হয়।

সমাজের মধ্যে অত্যাচার, অবিচার আর অবহেলার ঘটনাও ঘটে চলেছে নিত্য। অত্যাচারিত, অবহেলিত আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষ মনে মনে খুঁজে পেতে চায় তার থেকে বেশি শক্তির কিছু যাতে সে তার প্রতি বঞ্চনার প্রতিকার পায়। রূপকথার মায়াবী রাক্ষসী কিংবা ভয়ংকর দৈত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপযুক্ত সাহসী আর বলশালী রাজপুত্রের কল্পনা ঠিক সেই জন্যেই।

হয়তো মানুষের মনের এমন ইচ্ছেই জন্ম দিয়েছে ভয়াল দর্শন তুষামানব ইয়েতির। সে থাকে এমনই এক জমাট বাঁধা তুষার ঘেরা অঞ্চলে যা সাধারণ মানুষের অগম্য। অর্থাৎ খুব সহজে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না।

এটা মিথ হোক বা হোক বাস্তব, একে ঘিরে বিতর্কের যেমন শেষ নেই তেমনি বিরতি নেই এই বিষয়ে গবেষণার। তত্ত্ব, তথ্য, প্রচার আর প্রসার

ঘটে চলেছে আর চলবেই। বলাই বাহুল্য বর্তমান এই গল্পের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র সবই কেবল কল্পনার তুলিতে আঁকা। এই গল্পের চরিত্রগুলি কেউ ইয়েতির অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। কেউ কেউ আবার তাকে দেবতা হিসেবেই কল্পনা করেছিল। তাদের বিশ্বাসের ফলশ্রুতি তাদের কি দিয়েছিল সেটা নিয়েই এই গল্প।

রোমাঞ্চকর আর রোমহর্ষক গল্পের শেষ পর্যন্ত পড়ে তো যেতেই হবে। দেখা যেতেই পারে এ কোন দিশা দেয়।

বৈদ্যবাটী, হুগলী

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

এক

ডা. সুপ্রকাশের ডায়েরি

১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪

ছেলেবেলা থেকেই আমার মনের গভীরে একটা স্বপ্ন ছিল। সাদা এক প্রাণীকে ঘিরে রঙিন এক স্বপ্ন। দিবারাত্র মনের মধ্যে যে বাসনাটি আকুলি বিকুলি করে মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত সেটা সেই প্রাণীটাকে দেখার। এই স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল প্রাণীটিকে ঘিরে একটা মিথ আর অসংখ্য কল্পকাহিনি শোনার পর থেকেই।

সব কাহিনিগুলোই যে কল্পনার কালি দিয়ে লেখা হয়েছিল তা হয়তো নয়, কিংবা হতেও পারে। গল্পগুলোর লেখকেরা তো প্রথমে দাবি করেছিলেন এগুলো গল্প নয় সত্য। কিন্তু প্রমাণের চৌকাঠে এসেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। চৌকাঠ অতিক্রম করে ঢুকতে পারেননি কেউ সেই সত্যের ভিতরে। সকলের সব কলম ভেঁতা হয়ে গেছে।

তবে আশ্বাসের কথা এই যে, তাদের কলমের আঁচড়ের দাগ কিন্তু মিলিয়ে যায়নি। আর সেই শুকিয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া বিবর্ণ সেই আঁচড়ের দাগ থেকে গড়ে উঠেছে আরও অনেক নতুন নতুন গল্প। গল্পের যেমন শেষ নেই, শেষ নেই মানুষের কল্পনা আর আগ্রহেরও। নিরন্তর চলেছে সাদা রঙের সেই প্রাণীটিকে ঘিরে আগ্রহ আর কৌতূহল নিরসনের প্রতিযোগিতা। তবু এই প্রাণী আজও নাগাল ছাড়া। আজও আমরা খুঁজে চলেছি তাকে সমান ঔৎসুক্য আর উৎসাহ নিয়ে।

একই রকম আগ্রহ ছিল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডাইনোসোরকে নিয়ে। এই লুপ্ত প্রজাতির প্রাণীকে নিয়ে রচিত হয়েছিল মিথের পরে মিথ। গবেষণার পরে গবেষণা। অবশেষে লুপ্তকে বার করে আনা হয়েছিল গুপ্তস্থান থেকে। প্রাগৈতিহাসিক তকমা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে স্থান পেয়েছিল ইতিহাসে। মানুষের

আগ্রহের ইতিহাসে। মানুষের আবেগের ইতিহাসে। ডাইনোসোর নিয়ে বিস্তর গবেষণা তো বটেই, গড়ে উঠেছিল কত কল্পকাহিনি। এমনকী, কত বিখ্যাত সিনেমাও। ডাইনোসোর সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল মিটিয়েও যেন মেটাতে পারছে না এইসব কাহিনিগুলো।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪

গতকাল আমি ডাইনোসোর নামে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটির কথা লিখেছিলাম। কিন্তু এটা পরিষ্কার করা দরকার যে আমার আগ্রহের প্রাণীটি ডাইনোসোর নয়। ডাইনোসোর যতই প্রাগৈতিহাসিক হোক, যতই হোক অতীত, সে তবু সত্য, অর্থাৎ সে ছিল বিদ্যমান। কিন্তু আমার আগ্রহ যে প্রাণীটিকে নিয়ে তার অস্তিত্ব এখনও সন্দেহের পুরু আবরণে মোড়া। এখনও তার দুষ্প্রাপ্য চুল, লোম, হাড় এসব নিয়ে চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর অবশ্যই ডিএনএ টেস্ট। কারণ প্রাণের প্রমাণ আর অস্তিত্ব লুকিয়ে থাকে ডিএনএ-র মধ্যেই।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

হ্যাঁ, গতকাল যে প্রাণীটির কথা বলছিলাম তা হল ইয়েতি। কিন্তু এটি প্রাণী নাকি প্রাণীর কল্পনা তা আজও পরিষ্কার হয়নি। যেখানে ধোঁয়া থাকে সেখানেই মানুষের আগ্রহ আর কৌতূহল বাড়ে। কোথাও ধোঁয়া দেখলে সেখানে আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণে বদ্ধ পরিকর মানুষ।

অনেক বিজ্ঞানী আর স্থানীয় লোকেরা বলছেন সে নাকি আছে। কিন্তু কোথায় আর কেমন ভাবে আছে তা বলতে পারছে না। এমনকী আদৌ আছে কিনা তার কোনও জলজ্যান্ত প্রমাণও উপস্থিত করতে পারেনি তারা। কল্পনা, কৌতূহল আর ভয় মিশ্রিত এক অজানা শ্রদ্ধা দিয়ে তারা গড়েছে বহু গল্প।

সেই ছোটবেলায় ইতিহাসে পড়েছিলুম বোধহয় তার কথা। বীরের কথা পড়তে কে না ভালবাসে। বীর আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটা চমকপ্রদ মিথ। সেই মিথ ছিল ইয়েতিকে ঘিরে। তিনি নাকি ভারতে আসার পথে হিমালয়ের তুষারঘেরা অঞ্চল অতিক্রম করতে গিয়ে ইয়েতি দেখেছিলেন। স্থানীয়েরাও কেউ কেউ তাঁর এই ধারণায় সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা এও বলেছিল এই প্রাণীটি হিমালয়ের খুব উঁচু জায়গার অধিবাসী আর সমতলে তারা বাঁচে না।

এই ইতিহাস অনেক বিজ্ঞানীকে অনেক আশা যুগিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে অনেক

গবেষণা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে অনেক বইও। এই ইতিহাস আমাকেও বড় আশান্বিত করেছিল। যতই বড় হয়েছি ততই ভেবেছি, এই প্রাণীটির অস্তিত্ব আমি একদিন না একদিন প্রমাণ করে ছাড়বই ছাড়ব।

২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

গতকাল ডায়েরি লেখা হয়নি। কারণ অবশ্য অনেক আছে। একটা কারণ অবশ্যই সময়ের অভাব আর সেই সময়ের অভাবেরও অনেক কারণ ছিল। কাল আবার রাতের দিকে ঝড় হয়েছিল। আর এ ঝড় আমাদের সমতলের ঝড় নয়। যে ঝড়ে শুধুই ধুলোবালি পাক খেতে থাকে বড় জোর। সাংঘাতিক হল মরুর ঝড় যেখানে বালি উড়ে সব কিছু বালির নীচে চাপা দিয়ে দেয় মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে।

আর এখানে তুষারের ঝড়, যাতে বালির মতো ছোট ছোট শুকনো বরফের কুচি ওড়ে আর মাত্র কয়েক মুহূর্তে সব কিছু গভীর বরফের নীচে চাপা দিয়ে দেয়। যারা আচ্ছাদনের নীচে থাকে তারা একরকম। আর যারা খোলা আকাশের নীচে থাকে তাদের এই বরফের স্তূপে চাপা পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এমনকী স্বাভাবিক চাপা পড়ে মারা যাওয়াটাও।

আমিও হয়তো পড়তাম। বরফের নীচে কিছুদিন হয়তো আমার প্রাণটা ধুকপুক করত। তারপর কাটাত পৃথিবীর মায়া। কিন্তু পারল না আমার উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে। আমি খুব উঁচু উঁচু করে লাফ মেরে ছুটেছি। তাতে আমার পা সর্বদাই বরফকে চাপা দিয়ে গেছে কিন্তু বরফ আমাকে চাপা দিতে পারেনি কখনও।

তবে এমনটা অবশ্য খুব বেশিক্ষণ চলতে পারত না কারণ ধীরে ধীরে ঝড়ের গতি বাড়ছিল। আর বেশি বেশি করে বরফ উড়ে আসছিল। আমার সারা শরীরে বরফে ভরে গিয়েছিল। শরীর ভারী হয়ে আসছিল আর প্রচণ্ড ঠান্ডায় আমি অস্থির হয়ে উঠছিলুম। যাহোক, ভগবানের কৃপায় এক সময় বরফের ঝড় থামল। শেষ লাফটা মেরে আমি যে স্তূপের মাথায় পা রেখেছিলুম তার উচ্চতা অন্তত ফুট ছয়েক তো বটেই। আমার ক্যাম্প খুব একটা দূরে ছিল না তাই পৌঁছে গেছি মোটামুটি নিরাপদেই।

সেদিন আর ডায়েরি লিখতে মন ওঠেনি। আর লেখার মতো বিশেষ কিছু ছিলও না। ইয়েতি নিয়ে একটা বই পড়ছিলাম। একটা সাম্প্রতিক বই। মাত্র ২০১৩ সালে লেখা। বেশ ভাল লাগছিল। আর আগের কিছু বইয়ে তো অনেক কিছু পড়েছি। ইয়েতির সম্পর্কে অনেক কিছু। আধুনিক গবেষণায় বেরিয়ে

আসা অনেক চমকপ্রদ তথ্য আমার মনে অনেক আশা যুগিয়েছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমি প্রমাণ করতে পারব ইয়েতির অস্তিত্ব অথবা একেবারে সরাসরি মানুষের সামনে হাজির করতে পারব একটা বা একাধিক ইয়েতিকে।

দুই
জাগ্রত কৌতূহল

২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

এই তিনদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। আমি কলকাতা থেকে বা আমাজনের সাহায্যে বিদেশ থেকে ইয়েতির উপর যে ক'টা বই আনিয়েছিলাম সেগুলো সব পড়ে ফেলেছি। আমার স্থানীয় গাইড পামার পাশের তাঁবুতে থাকে। বেশ শক্ত সমর্থ পাঁচ ফুট উচ্চতার পুরুষ। আমি অবশ্য তিব্বতি ভাষা জানি না। কিন্তু পামার ভাঙা ভাঙা বাংলা, হিন্দি আর ইংরেজি জানে। তাতেই কাজ বেশ ভাল চলে যায়। খুব খাটতে পারে ছেলেটা। পঁচিশ বছরের নিটোল এক শ্বেত-পাথরে কাটা মূর্তি যেন। এক নাগাড়ে অনেকটা পাহাড়ি পথে চলেও সে অনায়াসে রান্না করতে পারে তার আর আমার জন্যে।

ইয়েতিদের ব্যাপারে আমি খুব আগ্রহী হয়ে পড়ি একটা বই পড়ে। ২০১১ সালে রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় বিগফুট বিশেষজ্ঞদের এক সভায় এক প্রাণীবিদ আর গবেষক হঠাৎ নাকি দাবি করে বসেছিলেন যে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন যে ইয়েতি শুধু আছে তাই নয়, তারা রীতিমতো এক বিশেষ কায়দায় গাছের ডাল বাঁকিয়ে বাসা তৈরি করে বসবাসও করতে পারে।

এর পরে অবশ্য আর এক বিশেষজ্ঞ এই দাবি খারিজ করে দিয়ে বলেন, ইয়েতি ফিয়েতি কিছু নেই। ওই গাছের ডাল বাঁকিয়ে বাসা তৈরি করার কথাটা একটা বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই যে গাছের ডাল বাঁকিয়ে বাসা তৈরি করার কথাটা আমার খুব মনে ধরে গিয়েছিল। এর আগে ইয়েতির চেহারা আর হাভভাব সম্পর্কে যারা একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলেন তারা ইয়েতির ব্যাপারে শুধু একটা মিথই খাড়া করেছিলেন। অর্থাৎ এই প্রাণীগুলো যেন তুষারাবৃত হিমালয়ের এক মায়াদৈত্য। তাদের দেখা যায় আবার দেখা যায় না। কিন্তু এই যে গাছের ডালে বাসা করার বিষয়টা আমার মনে এক

সাংঘাতিক কৌতূহল জাগিয়েছিল এই ভেবে যে, ইয়েতিরাও তবে আমাদের মতোই সংসারী প্রাণী। তারা কোনও মায়া বা মিথ নয়। তারা বাস্তব। তাই এদের খোঁজ করতেই হবে। ছাড়লে চলবে না।

আজ দুপুরে আমার গাইড কাম ফ্রেন্ড পামার এক সুন্দর ডিশ বানিয়েছিল, সেই ডিশের নাম হল থুকপা স্যুপ। নেপাল, ভুটান, এমনকী এটা চীনেরও বেশ জনপ্রিয় ডিশ। গাজর, বাঁধাকপি, ঢ্যাঁড়স, টোম্যাটো, রসুন, গোলমরিচ, দারচিনি, মধু, মাখন এসব দিয়ে সুন্দর সুস্বাদু এই ডিশ খেয়ে দুপুরে জোর ঘুম হয়েছিল। আর বোধহয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম ইয়েতির ব্যাপারে।

কী অদ্ভুত স্বপ্নটা! একটা ইয়েতি নাকি আমাদের এই তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে থুকপা স্যুপের গন্ধে মোহিত হয়ে টেন্টে ঢুকে পড়েছে। আর গাইড পামার তো একেবারে হতভম্ব! সেও তার জীবনে এ পর্যন্ত এ প্রাণীটি দেখেনি। ছানাবড়া চোখ করে সে ছুটে এসেছে আমাকে ডাকতে।

এটা যে নিছকই একটা স্বপ্ন ছিল তা ঠিকই। আর পামার আমার টেন্টে ঢুকেছিল আমাকে ডাকতে এটাও ঠিক। এমনকী স্বপ্নটা দেখছিলাম ঠিক সেই সময় যখন দিনের আলো সম্পূর্ণ নিভে গিয়েছিল। অর্থাৎ সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। এতগুলো ঠিকের মধ্যেও যে বেঠিকটা ছিল তা হল, এটা বাস্তবে মোটেই ঘটেনি। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। এর আগের সমস্ত ইয়েতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া ইয়েতির দেহের বর্ণনা, তার শক্তি কিংবা গাছের ডালে বাসা করার বিষয়গুলি থেকেই আমার মগজ এই স্বপ্নটা গড়ে নিয়েছিল বলে আমার মনে হল।

তাঁবুর ভিতর তখন আবছা আলো। আমার একটা ল্যাম্প ছিল যেটা জ্বলত পাহাড়ি কিছু জন্তু জানোয়ারের শরীরের চর্বি দিয়ে। অন্যদিন খাওয়ার পরে সামান্য দু'-পাঁচমিনিট একটু গড়িয়ে নিয়ে আমি উঠে বই পড়ি বা অন্য কাজ করি। সন্ধ্যা হলে আলো জ্বালি। চর্বির এই তেল বেশি পাওয়া যায় না তাই আমি খুব যত্ন করে তার ব্যবহার করি।

আমার তাঁবু আর পামারের তাঁবু পাশাপাশি হলেও সরাসরি একটার মধ্যে দিয়ে আরেকটায় যাওয়া যায় না। যেতে গেলে বাইরে দিয়েই যেতে হয়। ঘুম ভেঙে দেখি তাঁবুর মুখে আবছা আলোয় পামার দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা না গেলেও সে যে বেশ উত্তেজিত তা বোঝা যাচ্ছিল তার গলার আওয়াজে। আমাকে জাগতে দেখে সে ছুটে আসে আমার বিছানার কাছে প্রবল উত্তেজনা নিয়ে।